ঃ এই সংখ্যায় ঃ
খাবার নিয়ে ভাবুন,
পঃবঙ্গে পাখির খোঁজ
'ভাবনা', দেহদান,
ব্রহ্মাণ্ডের বয়স, রিপোর্ট

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩। কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

বর্ষ-১০ সংখ্যা - ৩ মে-জুন/২০১৩ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

গণিত সাধক রামানুজন

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ ভারতের এরোডে এক নিষ্ঠাবান ও দুঃস্থ পরিবারে রামানুজনের জন্ম। পুরো নাম শ্রীনিবাস রামানুজন আয়েঙ্গার। তাঁর পিতা কুপ্পুস্বামী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কুম্বাকোনামের এক কাপড় ব্যবসায়ীর দোকানে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরাণীর কাজ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও নম্র প্রকৃতির। রামানুজনের মাতা কোমলতাম্মল সকলে বিচক্ষণ, দৃঢ় সংকল্প, সংস্কৃতিমান এবং বুদ্ধিমতী মহিলা। পরিবারের সকলে আদর করে রামানুজনকে 'চিয়াস্বামী' বা 'ক্ষুদে প্রভু' (Little Lord) বলে ডাকতো।

পাঁচ বছর বয়সে রামানুজনকে শহরের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হলো। রামানুজন আর পাঁচটা ছেলের মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন শান্ত, লাজুক ও ভাবুক প্রকৃতির। একা একা থাকতে ভালোবাসতেন। অন্য ছেলেমেয়েরা যখন খেলা করতো, ছোটাছুটি করতো রামানুজন তখন জানালা দিয়ে তা দেখতে ভালোবাসতেন। পরিণত বয়সেও রামানুজনের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা দেখে কাছের মানুষজন অবাক হতেন। ১৮৯৫ সালে রামানুজনকে কুম্বাকোনামের টাউন হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। ১০ বছর বয়সে প্রাথমিক পরীক্ষায় রামানুজন জেলার মধ্যে ১ম হন। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করতে থাকেন এবং প্রতি পরীক্ষায় গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পান। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে ১ম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ১ম বর্ষে ভর্তি হন এবং সুব্রামানিয়ন বৃত্তি অর্জনে সমর্থ হন।

স্কুলে পড়াকালীন রামানুজনের বিস্ময়কর গণিত প্রতিভায় সকলে চমৎকৃত হতেন। তিনি $\sqrt{2}$, π, e প্রভৃতি সংখ্যার দশমিকের পর বহুস্থান পর্যন্ত মান বলে দিতে পারতেন। ১২ বছর বয়সে তিনি যখন থার্ড ফর্মের ছাত্র, এস. এল. লোনি-র ত্রিকোণমিতি বইটি হাতে পান এবং অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ঐ পুস্তকের সকল

এরপর 2 পাতায়

কন্যা সন্তান ঃ বিজ্ঞানের চোখে

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ইচ্ছে মত সন্তান বিশেষতঃ পুত্র সন্তান পাওয়ার অভিলাষ পোষণ করে। আমাদের পুরাণে উল্লেখ আছে, অতীতে কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায় জন্মাবার পরেই তাদের

এরপর 4 পাতায়

খেলনার বিপদ

হ্যাঁ, বাচ্চাদের আপাত নিরীহ খেলনা থেকেও হতে পারে ঘরের দূষণ -নানা সমস্যা। দূষণের বিপদ আসতে পারে প্লাস্টিকের খেলনা, পুতুল, গাড়ি ইত্যাদি থেকে। এমনিতেই সামগ্রিকভাবে পরিবেশ দূষণের জন্য প্লাস্টিকের এই খেলনাগুলো অনেকখানিই দায়ী। শুনতে অবাক লাগলেও ইনডোর পলিউশনেও বাচ্চাদের খেলনাগুলোর অবদান কম নয়। বিশেষ করে নরম নরম প্লাস্টিকের খেলনাগুলো তো নিরাপদ নয় মোটেই!

বাচ্চারা অনেক সময়ই খেলতে খেলতে এই ধরণের নরম নরম খেলনা পুতুলগুলো মুখেও দেয়; কেউ কেউ চিবোতে থাকে। এই ঘটনাটা অনেক সময় মা-বাবার চোখে পড়ে না, আবার চোখে পড়লেও অনেকেই তেমন গুরুত্ব দেন না। জানেন না যে এর থেকেও

এরপর 3 পাতায়

অতীত ভারতের বিজ্ঞানে কয়েকটি অবদান

একালে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে ভারতবাসী আমরা পাশ্চাত্যদের অনুকরণ করি এবং প্রাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরাই বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের আবিষ্কারক বলে জানি। কিন্তু অতীত ভারত যে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা দিকে যথেষ্ট উন্নত ছিল-এমনটি আজকের দিনে অনেকে মেনে নিতে পারি না। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৬৫ বছর অতিক্রান্ত। আগামী প্রজন্মদের নিজেদের সম্পর্কে আত্ম বিশ্বাস জন্মাতে দেশের ঐতিহ্যকে জানতে হয়।

—ঃ বসন্তের টীকা ঃ—

এদেশের ছেলেমেয়েদের একালে পড়তে হয় ১৮ শতকের শেষের দিকে জেনার এর বসন্তরোগের টিকা আবিষ্কারের ফলে মারাত্মক এই রোগের হাত থেকে পৃথিবীবাসী বেঁচে গিয়েছে। অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়, প্রায় ১৮ শতক অবধি সমগ্র ইউরোপে বসন্ত এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এ রোগের কোন জাত বিচার নেই। ধনীর দুলাল থেকে

এরপর 3 পাতায়

গণিত সাধক রামানুজন

1 পাতার পর

অঙ্কই সমাধান করেন। সূচকের মাধ্যমে সাইন ও কোসাইন অপেক্ষকের ব্যঞ্জনা নির্ণয় করেন।

১৯০২ সালে তাঁর জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। কেমব্রিজের শিক্ষক জি.এস.কার এর 'Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics' বইটি হাতে পান। বইটিতে ছিল ছয় হাজারেরও বেশি সূত্র। কোনো সূত্রেরই প্রমাণ ছিল না। বইটিতে ছিল অতি অতি জ্যামিতিক অপেক্ষকের অবিরত ভগ্নাংশের রূপ, গুনোত্তর শ্রেণি, উপবৃত্তীয় সমাকলের উপপাদ্য ইত্যাদি। রামানুজন একাকী সূত্রগুলি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। অনেক সূত্র আবিষ্কারও করলেন। ১৯০৭ সাল নাগাদ রামানুজন তাঁর বিখ্যাত 'নোটবই' তিনটির প্রথমটিতে সূত্রাবলী লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন কোনো প্রকার প্রমাণ বা প্রমাণ সংকেত না দিয়ে।

১৯১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টে ৩য় শ্রেণির চতুর্থ স্তরে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে করণিকের কাজে রামানুজন যুক্ত হলেন। অভাবের সংসারে গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা হলো। তিনি তীব্রগতিতে গণিত গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অফিসে কাজ করার সময় যা টুকরো কাগজ হাতে পেতেন তাতেই গণনাদির কাজ করতেন। ফলসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। গণিতে রামানুজনের দক্ষতা ও কীর্তি তাঁর চারপাশের মানুষজনের কাছে প্রকাশিত হতে লাগলো। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'Some propertics of Bernoulli's শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র ইন্ডিয়ান ম্যাথেমিটিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৩ সালের ১৬ জানুয়ারী তারিখে রামানুজন ট্রিনিটি কলেজের প্রখ্যাত গণিতাবিদ জি.এইচ. হার্ডিকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিতে ছিল অতি জ্যামিতিক শ্রেণি, নির্দিষ্ট সমাকল, অবিরত ভগ্নাংশ, অসীম অভিসারিক মান ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর ১২০টি উপপাদ্যের বিবৃতির সমাবেশ। ১৯১৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী হার্ডি রামানুজনকে উত্তর দিলেন। হার্ডি লিখলেন "আমি আপনার চিঠি এবং উপপাদ্যের বিবৃতিগুলিতে অতিশয় আগ্রহী। ....আপনার বিবৃতিগুলির প্রমাণ আমি বিশেষভাবে দেখতে চাই। ....আপনি যত শীঘ্র সম্ভব কিছু প্রমাণ পাঠাবেন"। 'হার্ডি রামানুজনকে কেমব্রিজে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে রামানুজনের মায়ের আপত্তি ছিল। যাই হোক অবশেষে ১৯১৪ সালের ১৮ এপ্রিল রামানুজন কেমব্রিজে পৌঁছালেন। পরবর্তী ৩ বছর রামানুজনের কাছে ছিল সবচেয়ে সুখময় এবং সৃষ্টিশীল সময়। ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে গবেষণার জন্য ট্রিনিটি কলেজ রামানুজনকে বি.এ. ডিগ্রীকে ভূষিত করে। রামানুজনের গবেষণাপত্রের সংখ্যা ৩৭। কেমব্রিজে থাকাকালীন সময়ে লেখেন ২৭টি। এর মধ্যে ৭টি হার্ডির সঙ্গে যৌথভাবে।

রামানুজন তখন পরিবার-পরিজন থেকে বহু দূরে। বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তাছাড়া ঠান্ডা আবহাওয়া, রামানুজনের ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। যুদ্ধকালীন অনটন, অপরিচিতি খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি তাদের প্রাপ্য বুঝে নিতে চাইল। ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯১৯ সালে ভারতে ফিরে আসার আগে পর্যন্ত তাঁকে প্রায়ই কাটাতে হয়েছিল ওয়েলস্, ম্যাটলক এবং লন্ডনের নার্সিংহোমে বা স্বাস্থ্যনিবাসে। রোগটি যক্ষ্মা, যার কোনো চিকিৎসাই তখন ছিল না। দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার কারণে রামানুজনের মানসিক অবস্থাও খারাপ হতে লাগল। তার সাথে আরেকটি বিষয় যুক্ত হয়েছিল, রামানুজনের মনে হয়েছিল কেমব্রিজে আসার আগে তিনি গণিতে যা যা করেছেন, সবই ইউরোপীয় গণিতবিদ্দের কাজের পুনরাবিষ্কার। এই বিষয়টি তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ভূগর্ভস্থ রেলগাড়ীর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। রেলগাড়ীর গার্ড ও পুলিশের হস্তক্ষেপে তিনি বেঁচে যান। হার্ডির হস্তক্ষেপে গ্রেপ্তারের হাত থেকেও বাঁচেন।

ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অসুস্থতা সত্ত্বেও রামানুজন উচ্চমানের কাজ করে যেতে লাগলেন। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রামানুজনকে রয়াল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচিত করা হয়। এর আগে কোনো ভারতীয় এই সদস্যপদ পাননি। এরপরেই তিনি ট্রিনিটি কলেজের সদস্যপদ পান। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ৫ বছরের জন্য সদস্য বৃত্তি প্রদান করে।

দেশে ফিরে এলে ভালো হয়ে উঠবেন, এই আশায় ১৯১৯ সালের ২ এপ্রিল তিনি মাদ্রাজে ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠলেন না। ১৯২০ সালের ২৬ এপ্রিল মাত্র ৩২ বছর ৪ মাস ৪ দিন বয়সে তাঁর জীবনাবসান হলো।

রামানুজনের গণিত গবেষণার বহুমুখী ক্ষেত্রগুলি হল — অবকল ভগ্নাংশ, ক্রমিক ভগ্নাংশ, অসীম শ্রেণি, পরাজ্যামিতিক শ্রেণি, অপেক্ষক তত্ত্ব, উপবৃত্তীয় মডিউলার অপেক্ষক, জিটা অপেক্ষক, টাও অপেক্ষক, মক-থিটা অপেক্ষক, নির্দিষ্ট সমাকল, সংখ্যা তত্ত্বের বিভিন্ন শাখা যেমন মৌলিক সংখ্যা, যৌগিক সংখ্যা, বিভাজন তত্ত্ব প্রভৃতি।

অসাধারণ স্মৃতি শক্তি অকল্পনীয় অনুমান ক্ষমতা, তড়িৎ গতির গণনা কুশলতা ছাড়াও ধৈর্য, তিতিক্ষা, শ্রমের প্রতি ভালাবাসা প্রভৃতি গুণের দ্বারা রামানুজন যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন বা যে ধরণে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাকে বর্ণনা করার জন্য কোনো শব্দই যথেষ্ট নয়। তাঁকে সর্বকালের সর্বদেশের সেরা গণিতজ্ঞ লিওনার্ড অয়লার, কার্ল ফ্রেডরিক, গাউস, কার্ল গুস্তাভ জেকব জ্যাকোবি এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। রামানুজন প্রাচ্যের ষ্ঠে গণিতজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর গণিত প্রতিভার স্বীকৃতিতে এইচ. ডব্লু. টার্নবুল যথার্থই বলেছেন, " Judged by absolute standard of greatness among all Mathematicians of the East, the genius of Ramanujan appears to be supreme".

মাত্র ৩২ বছর জীবিতকালের মধ্যে তার প্রতিভার দুর্গত ও মেধার ব্যাপ্তিতে তিনি সারা বিশ্বকে বিমোহিত করেছেন। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী যেন এক রোমাঞ্চকর চলচিত্রের চিত্রনাট্য। দারিদ্র, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অথবা শারীরিক অসুস্থতা কোনো কিছুই তাঁর গণিত গবেষণার কাজে বাধা হয়ে ওঠে নি।

—গোবিন্দ দাস, E-mail : gcd.cos.1929@gmail.com
চলভাষ-8420040852

অতীত ভারতে বিজ্ঞানে অবদান

1 পাতার পর

বস্তিবাসী সকলেই শিকার এ রোগের। ইউরোপে যখন এই অবস্থা প্রাচ্য দেশে কিন্তু এই রোগ এতটা ভীষণ ছিল না। যদিও মানুষের মধ্যে যথেষ্ট কুসংস্কার ছিল - দেবতার রোষেই মড়ক লাগে ইত্যাদি। তবু ভারতের মত দেশেও অজানা অতীত থেকে গরুর দেহের বসন্ত রোগের পুঁজ থেকে ওষুধ প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। শুধু ভারত কেন ইউরোপের পূর্বে তুরস্কের মানুষও অতীতে জানতো বসন্তরোগের প্রতিষেধক। বছরের বিশেষ সময় কিছু বৃদ্ধা বসন্তের শুকনো বীজ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন - পাড়ায় বাচ্চাদের জড়ো করে ছুঁচের ডগায় ঐ বীজ বাচ্চাদের হাতে, পায়ে, গায়ে আঁচড় কেটে লাগিয়ে দিত - এতে ওদের দেহে সামান্য গুটি হয়ত দেখা দিত কিন্তু মারাত্মক বা জীবনহানি থেকে বেঁচে যেত।

—ঃ প্লাস্টিক সার্জারি ঃ—

আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির জন্ম বেশি দিনের নয়। ১৯ শতকে এডওয়ার্ড জেইস (Edward Zeis) নামে একজন শল্য চিকিৎসক ১৮৩৮ খ্রীঃ প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে একটি বই লেখেন। এই সময় থেকে পশ্চিমি দেশগুলিতে প্লাস্টিক সার্জারির সূত্রপাত। তবে প্লাস্টিক সার্জারির এইটুকু সব ইতিহাস নয়। ভারতে খ্রীষ্টজন্মেরও বহু আগে এই ধরণের শল্য চিকিৎসার প্রচলন ছিল। সুপ্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি যে যথেষ্ঠ উন্নত ছিল। একথা সুবিদিত। শুশ্রুত এর কালেও এ বিদ্যার নির্দিষ্ট স্থান ছিল। এটি আমাদের কথা নয়। অতি বিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র পন্ডিতরা বলেছেন ঃ *'As early as our earlier than 800 B.C., the Hindus restored missing facial features'* অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৮০০ আগেও হিন্দুরা মুখমন্ডলের হারিয়ে যাওয়া আকৃতিকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। এই কারণে সেযুগে অপরাধীদের কান বা নাক কেটে শাস্তির প্রচলন ছিল।

প্লাস্টিক সার্জারি আধুনিককালে সার্জারি বা শল্য চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর দ্বারা দেহের কোনও স্থানের গঠন ও আকৃতির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এই সার্জারিতে শুধু যে ছোট চোখ পটল চেরা, ভোঁতা নাক বাঁশির মত করাই একমাত্র কাজ নয়। বস্তুতঃ আগুনে বা কোন দূর্ঘটনায় বা জন্মগত বিকৃত কোনও অঙ্গকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আকৃতি দিতে প্লাস্টিক সার্জারি অত্যাবশকীয় পদ্ধতি।

স্বভাবতই বলা যায়, জটিল এই শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি অতীত ভারতের জানা ছিল। অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রে সেযুগে ভারত কি পরিমাণ উন্নত ছিল সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। পরবর্তীযুগে নানা কারণে ভারতীয়রা সেই বিদ্যা হারিয়েছেন। বলা বাহুল্য, চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে একালে অতি জরুরি প্লাস্টিক সার্জারি মানব সেবায় এক নতুন মাত্রা এনেছে।

— লেখক : রণতোষ চক্রবর্ত্তী, নবপল্লী, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১২৬, ফোন -(০৩৩) ২৫৪২১১৬৭

খেলনার বিপদ

1 পাতার পর

হতে পারে বাচ্চাদের স্বাস্থ্য সমস্যা। বিশেষকরে দাঁত ওঠার সময় অনেক বাচ্চাই তাদের প্রিয় খেলনাগুলোকেই মুখে পুরে কামড়াতে থাকে অনবরত, সে সব সামলাতে মা-বাবার হয় এক নাজেহাল অবস্থা। আজকের এই দূষণের পৃথিবীতে কোন কিছুই আর নিরাপদ নয়, তাই সময় এসেছে এইসব দিকেও নজর দেওয়ার, গুরুত্ব দেওয়ার। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই খেলনাগুলো চিবোনোর সময় বা মুখে দেওয়ার সময় বাচ্চাটি নীরবে-নিঃশব্দে শিকার হচ্ছে বিষাক্ত পিভিসি (পলি ভিনাইল ক্লোরাইড) দূষণের। এই খেলনাগুলো থেকে একই সঙ্গে বেশ কিছু বিষাক্ত টক্সিন করে, যা সরাসরি মেশে ঘরের বাতাসে ও ঘর-দোরের বাতাস দূষিত হয়ে পড়ে, পরিণামে ডেকে আনে ইনডোর পলিউশন। অনেক বাচ্চা স্নান করার সময় বা এমনিই এই খেলনাগুলোকে জলে ভাসিয়ে খেলে। নানা গবেষণায় দেখা গেছে যে এতে বাথটাবের জলও এই বিষাক্ত টক্সিনগুলোর কারণে দূষিত হতে পারে। যার ফলে বাচ্চাদের মধ্যেও দেখা দিচ্ছে নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা।

ভাবছেন তো কীভাবে?

বেশির ভাগ বাচ্চাদের খেলনা প্রস্তুতকারী সংস্থা খেলনা তৈরির সময় ব্যবহার করেন বিষাক্ত ভিনাইল - পিভিসি নামে যা বাজারে পরিচিত। এটি মেশানো হয় ফাইলেট নামের আরেকটি রাসায়নিকের সঙ্গে। থালেট, এটিও সমান বিষাক্ত একটি রাসায়নিক পদার্থ। এরফলে, তৈরি হওয়া খেলনাটি শক্ত না হয়ে, কমনীয় ফ্লেক্সিবল হয় অর্থাৎ বেশ নরম-নরম, হাতে নিলে বেশ আরাম লাগে, ভালো লাগার বোধ জাগে। ফলে বাচ্চাদেরও শক্ত জিনিসে হাত-পা কেটে যাওয়ার কোন ভয় থাকে না। খুশি হয় বাচ্চারা। প্লাস্টিকের খেলনা নরম করতে সাধারণত দুটি থালেট (Phthalate) খুব বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন -

১) DEHP (Diethylhexyl phthalate) ২) DNIP (Di-isonoyl phthalate)

এইসব রাসায়নিকের সাহায্যে প্লাস্টিকের খেলনাগুলোকে না হয় নরম-নরম কমনীয় করে বাজারে আনা হয় তারপর সেখান থেকে আপনার -আমার ঘরে ঘরে, আদরের সোনামণিদের হাতে-হাতে, মুখেও!

আর এতেই তো বাড়াচ্ছে বিপদের সম্ভাবনা। এরফলে দেখা দিতে পারে বাচ্চাদের নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা।

কী কী স্বাস্থ্য সমস্যা? তাহলে, জেলে রাখুন -

১। ক্যানসার, ২। যকৃত ও বৃক্কের রোগ, ৩। কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে স্তনগ্রন্থির প্রিম্যাচিউর ডেভেলপমেন্ট।

এছাড়াও এসব খেলনা থেকে বেশিরভাগে সময় লেড, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতির মতো আরো নানা দূষিত পদার্থও মেশে ঘরের বাতাসে, শিশুর সারা শরীরে। আর তাতেই ডেকে আনতে পারে ক্যানসার, ফুসফুস বা ত্বকের নানা রোগ। ক্যাডমিয়াম কতটা ক্ষতিকারক বোঝাতে মজাকরে একটি রেসিপি দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা - শিশুবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, এক স্কুপ লেডে মাত্র এক চিমটে ক্যাডমিয়াম দিন, মিশ্রণটিকে ভালো করে মেশান। তারপর বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিন ও সেখান থেকে একটুখানি নিন। ব্যস! এইটুকুই আপনার আদরের সোনামণির ভবিষ্যত স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলবে ভয়ংকর, বাচ্চাদের শরীরের পক্ষে তা হানিকর, ভয়ের কারণ।

— লেখক : ড. সোমা বসু, ফোন -৯৪৩৩৯৪১৭৭৬

কন্যা সন্তান ঃ

1 পাতার পর

অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তানকে হত্যা করত।

পূর্বে মানুষের প্রজনন বিষয়ে কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য জানা না থাকায় পুত্র বা কন্যা হওয়ার বিষয়ে অনেক গল্প গাথা প্রচলিত ছিল।

এরিস্টটল ৩৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান ইচ্ছা মতো মানুষ জন্ম দিতে পারে বলে মন্তব্য করেছিলেন। যা পরে ভ্রান্ত ধারণা বলে প্রমাণ হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে আজও কোথাও কোথাও নানা প্রকার কুসংস্কার মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে আছে, যার জন্য পুত্র সন্তান লাভের আশায় শিবের মাথায় জল ঢালা, হত্যা দেওয়া, মানত করা, কবচ-তাবিজ, তুকতাক ইত্যাদি নানা প্রকার পদ্ধতি দেওয়া যায়। কোথাও যদি পুত্র সন্তানের জন্ম কাকতালিয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তখন শিবের বরে পুত্র প্রাপ্তি এ হেন প্রচার গল্পগাথার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর সুযোগ সন্ধানী অসাধু লোকেরা অর্থ উপার্জনের পসরা সাজিয়ে লোক ঠকাতে শুরু করে। আমাদের দেশ হুজুগের দেশ। মানুষের বাসনা মানুষকে হাজির করে তাদেরই কাছে।

পশ্চিমবঙ্গের মত তথাকথিত এহেন অগ্রসর রাজ্যেও পুরুলিয়ার বানজোড়া গ্রামে একদা যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল তা আর কিছুই নয়, পর পর ৪টি কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে শ্বশুর বাড়ির লোকজনের নিত্য অত্যাচারে জর্জরিত নমিতা বিষ খাইয়ে ও গলা টিপে মেরে ফেলল নিজেরই গর্ভজাত ৪টি কন্যাকে। তারপর নিজেও আত্মঘাতী হল গলায় দড়ি দিয়ে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পুরুলিয়ার বানজোড়া গ্রামের দরিদ্র পরিবারের নমিতা। শুধু দরিদ্র ও অনগ্রসর পরিবারে যে এরকম ঘটনা ঘটে তা নয় বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারেও এ ঘটনা ঘটে চলেছে। যদি সাধারণ লোকেরা পুত্র বা কন্যা সন্তানের জন্মের বৈজ্ঞানিক কারণ জানতে পারেন তাহলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিকে দৌড়াতে শুরু করবেন।

১৮২৭ সালে কার্ল ভন বিয়ার স্ত্রী স্তন্যপায়ীর ডিম্বাশয় থেকে প্রতি মাসে ডিম্বকোষ নির্গত হয় — এই তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৮৪১ সালে রুডলফ্ ভন কলিকার পুরুষের অন্ডকোষ শুক্রকীট সৃষ্টি হয়—তা প্রতিপন্ন করেন। ১৮৭০ সালে স্ত্রী প্রাণীর জরায়ুতে শুক্রকীট ও ডিম্বকোষ মিলনের ফলে যে প্রজনন ঘটে—এই বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০২ সালে স্যাক ক্লানগ্ দেহ কোষে ক্রোমোজোম বিশেষতঃ প্রজনন ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন।

মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম আছে। তার মধ্যে ২২ জোড়া অটোজোম এবং এক জোড়া প্রজনন সংক্রান্ত ক্রোমোজোম যা প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণ করে। এই ক্রোমোজোমকে সেক্স ক্রোমোজোম বা অ্যালোজোম বলে। স্ত্রীদেহের সেক্স ক্রোমোজোম দুটি একই প্রকার - XX কিন্তু পুরুষ দেহকোষের সেক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি X জাতীয় ও অন্যটি Y জাতীয়। X সেক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে Y এর তুলনায় বড় ও ভারী। শরীরের জনন মাতৃকোষের হ্রাস বিভাজনের ফলে শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয় এবং এদের মধ্যে একজোড়া (স্ত্রী XX এবং পুং XY) এর বদলে একটি মাত্র ক্রোমোজোম থাকে। কাজেই দুটির প্রতিটি ডিম্বকোষে X ক্রোমোজোম থাকে কিন্তু শুক্রকীটের মধ্যে Y এবং কিছুর মধ্যে X সেক্স ক্রোমোজোম বিন্যস্ত হয়। নিষেকের সময় শুক্রকীটের X এর সঙ্গে ডিম্বকোষের X এর মিলনের ফলে কন্যা সন্তান এবং শুক্রকীটের Y এর ডিম্বকোষের X ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলনে পুত্র সন্তান (অটোজোম ও XY ক্রোমোজোম) সৃষ্টি হয়। কাজেই পুত্র বা কন্যা হওয়ার বিষয়ে শুক্রকীটের Y এবং X সেক্স ক্রোমোজোম যথাক্রমে দায়ী। মানুষ কোনওভাবে দায়ী নয়। আর তুকতাক মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে স্বার্থসিদ্ধি করে এক শ্রেণীর মানুষ বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে সকল শুক্রকীট Y অথবা X ক্রোমোজোম বহন করছে তাদের একটি ভাগকে বিনষ্ট বা প্রভাবিত করে অন্যটির দ্বারা প্রজনন প্রভাবিত করতে পারলে তবে ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা সন্তানের সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানের অবদানে গর্ভস্থ শিশু পুত্র বা কন্যা তা আগে জানা সম্ভব হয়েছে— অ্যামনিয়োসিনটেসিস পদ্ধতিতে ১৯৫০ সালে। এর ফলে আকচার আগে ভাগে কন্যা সন্তান (ভ্রূণ) হত্যা হচ্ছে। তাই সুপ্রিম কোর্ট গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ অপরাধ বলে মন্তব্য করছে। আবার কৃত্রিম ভাবে শুক্রকীট বাছাই করার পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে চিকিৎসক ও গবেষক নারী সংখ্যা হ্রাসের (অবদমনের) আইনি ব্যবসা চালিয়ে চুটিয়ে রোজগার করছে আর সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনছে। ফলে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা অধিক হবে এবং ভারসাম্যতা জনিত সমস্যা ডেকে আনবে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা অসুস্থ হয়ে পড়বে। পুত্র বা কন্যা সন্তানের জন্য স্ত্রীর কোন অবদান বা দায় নেই, পুরুষেরও কোন দায় নেই। তবে পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণ ক্রোমোজোম Y-ই দায়ী এ কথা বলা যায়। যদিও তাতে পুরুষের করার কিছু নেই তথাপি অন্যায় ভাবে স্ত্রীকে দোয়ারোপ করা হচ্ছে। তাই যারা এই অন্যায়ভাবে অজ্ঞতা বশতঃ স্ত্রীদের অত্যাচার করছে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আইনে থাকা উচিত। শুধু থাকলে হবে না তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। সকলের বিজ্ঞান মনস্কতা ও অন্যকে বিজ্ঞান মনস্ক করার মধ্য দিয়ে সমাজ থেকে এই ব্যধি দূর করা যেতে পারে।

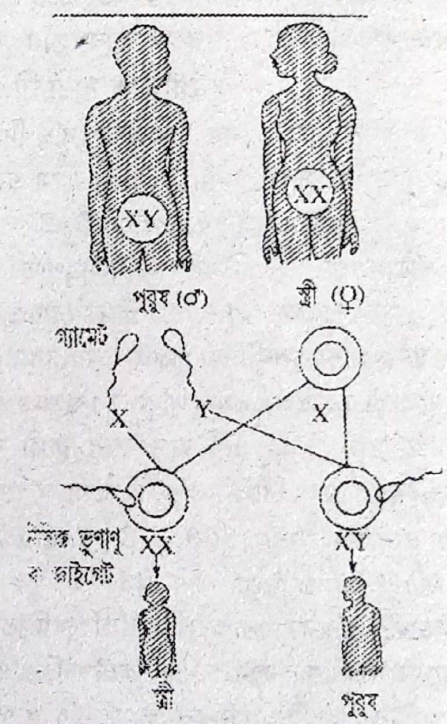

— লেখক : কানন কুমার প্রামাণিক, নির্মলাশ্রম, মনোহরচক, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, চলভাষ-৯৪৩৪৩৬৯৬৬১

খাবার নিয়ে ভাবুন

রঙের ব্যবহার

খাবারে রঙ মেশানো শুরু হয়েছিল মিশরীয় সভ্যতার সময় থেকে। তখন খাবারে প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করা হত। ১৮৫৬ সালে প্রথম কৃত্রিম রঙ (নাম মৌভাইন) প্রস্তুত হয়। এরপর ক্রমশ সারা পৃথিবীতে ব্যাপক হারে রঙের ব্যবহার শুরু হয়। উদ্দেশ্যে ছিল ক্রেতাদের মন জয় করা। বাজারে বা মিষ্টির দোকানে আমরা তো খুঁজি লাল টকটকে টমাটো, ডগমগ সবুজ উচ্ছে বা ঢ্যাঁড়শ, লাল দই, চকচকে মুগ বা মুসুরির ডাল। কৃত্রিম ভাবে তৈরী করা যেমন সহজ, দামেও অনেক কম। আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা। আর কৃত্রিম রঙিন খাবার খেয়ে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

খাবারে বিষ

সুগন্ধ আনার জন্য, পচন রোধের জন্য বা জীবাণু বৃদ্ধি রোধ করার জন্য খাদ্যে নানা বিষ (রাসায়নিক পদার্থ) মেশানো হয় যথা—

১) পচন রোধে কাঁচা মাংসে সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয় যা থেকে শ্বাস যন্ত্রের সমস্যা হয়, পাকস্থলির ক্যান্সার ও হতে পারে।

২) জ্যাম, জেলী, মাখন ও চিজ ইত্যাদিতে জীবাণু বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য বেঞ্জোয়েট ব্যবহার করা হয়। যা থেকে মাথা ও বুক ব্যাথা ও ঘাড়ের যন্ত্রণা হতে পারে।

৩) কাটা ফল ও সব্জিকে দীর্ঘ সময় তাজা দেখানোর জন্য যে সালফাইট ব্যবহার করা হয়, তা খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।

৪) আইসক্রীম, ঠান্ডা পানীয়, স্কোয়াশ, চকোলেট ইত্যাদি মিষ্টি জাতীয় খাবারে স্যাকারিন ও অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। স্যাকারিন দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকারক।

৫) শহর ও শহরতলি থেকে প্রতিদিন যে টন টন ছানা বিভিন্ন জেলা থেকে আসছে মিষ্টি তৈরীর জন্য বহু ক্ষেত্রে এগুলি সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে কাটানো দুধ থেকে তৈরী। এতে ছানা বেশী সময় টাইট থাকে। ভালো দাম পাওয়া যায়। ফলে মিষ্টির মাধ্যমে সালফিউরিক অ্যাসিড চলে যাচ্ছে বাঙালীর পেটে।

৬) সরষের তেলে শিয়াল কাঁটার তেল ভেজাল দেওয়া হয়। এছাড়াও পেট্রোলিয়ামজাত খনিজ তেল, ট্রাইক্রেসিন ফসফেট ভেজাল দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে কলকাতার বেহালা অঞ্চলে যে ভেজাল তেল খেয়ে বহু মানুষ পঙ্গু হয়েছিল তাতে ট্রাইক্রেসিন ফসফেট ভেজাল দেওয়া হয়েছিল।

প্রাকৃতিক রঙ

বেশ কয়েক বছর আগেই মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তি গবেষণা সংস্থা খাবারে মেশানোর উপযোগী প্রাকৃতিক রঙ সংগ্রহ করার কাজে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে। যেমন বিট থেকে লাল রঙ, কুসুম থেকে লাল ও হলুদ, জাফরান থেকে হলুদ, আঙুর থেকে গোলাপী, লঙ্কা থেকে লাল রঙ পাওয়া যায়। লাল অ্যানাট্টো, বেগুনী বিটানিন, কমলা-হলুদ ক্যারোটিন, সবুজ ক্লোরোফিল ইত্যাদি প্রাকৃতিক রঙগুলি খাবারে ব্যবহৃত হলে অনেক উপকার হয়, ক্ষতির কোনও আশঙ্কা থাকে না।

কোলা-পানীয় ঃ বিষ পান

প্রচারমাধ্যমে যেভাবে কোলা-পানীয় বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাতে চমক ছাড়া আর কিছুই নয়। কোলা বা ঠান্ডা পানীয় শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি করে যথা —

১) ঠান্ডা পানীয়তে ফসফোরিক বা সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে যা দাঁতের ও পাকস্থলির ক্ষতি করে।

২) উচ্চ চাপে যে কার্বন ডাই অক্সাইড মেশানো হয় তাতে পাকস্থলি থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরণ বৃদ্ধি করে। ফলে পাকস্থলি মারাত্মক ভাবে ক্ষতি হয়।

৩) ক্যাফিন, ব্রোমিনেটেড ভেজিটেবিল অয়েল ইত্যাদি ঠান্ডা পানীয়তে মেশানো হয়। এতে মাথা ব্যাথা, বমি হতে পারে।

৪) কোলা-পানীয়তে বিভিন্ন রঙ মেশানো হয় (যেমন কারমোজাইম, টারটাজিন, সানসেট ইয়েলো, পনকিউ ফোর-আর)। প্রতিটি রঙই শরীরে নানা রকম বিষক্রিয়া ঘটায়, ফলে শরীরে নানা রোগ হয়। নিয়মিত কোলা - পানীয় খেলে লিভারে মারাত্মক ক্ষতি হয়, যা থেকে সিরোসিস অব লিভার হতে পারে।

খাদ্যের মোড়কে মাদক

ময়দার মোড়কে মাদকের চোরা কারবারীদের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। কম দামে এফিড্রিন নামক মাদক পাউডার কিনে শহরের বিভিন্ন রেস্তোরা বা হোটেলের নাইট ক্লাবের পার্টিতে ড্রাগ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এফিড্রিন পাউডার সাদা গুঁড়ো ময়দার মতো দেখতে। নেশা করিয়ে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয় বা অপরাধ জগতে নিয়ে যাওয়া হয়। আইনানুযায়ী চোরা কারবারীদের কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার।

এরপর 6 পাতায়

খাওয়ার বিপদ

চকচকে বেগুন, সবুজ করলা ও পটল, লাল তরমুজ দোকানে দেখে মুগ্ধ হই। চকচকে বেগুনে পোড়া মবিল মাখিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। পটল ও করলা তুঁতের জলে রঙ করা হয় চির সবুজ রাখার জন্য। হলুদ, ডাল ও লঙ্কার ওড়োয় যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহৃত মেটানিল ইয়েলো, লেড ক্রোমেট ও বিভিন্ন কোলটার ড্রাই।

গরুর দুধ আর মোষের দুধ দেখতে কি একই রকমের?

দুধ দেখতে সাদা—এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু মোষের দুধ আর গরুর দুধের রঙের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। মোষের দুধ ধবধবে সাদা। কিন্তু গরুর দুধের রঙ সামান্য হরিদ্রাভ, কারণ ক্যারোটিনের উপস্থিতি। ফলে দুধের রঙের সাদা ভাবটা কিছুটা ম্লান করে দেয়।

মোষের দুধের চেয়ে গরুর দুধের চাহিদা বরাবরই বেশী। তাই মোষের দুধকে গরুর দুধ বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়। এরজন্য একটা পদ্ধতি চালু আছে— মোষের দুধ গরুর দুধের চেয়ে ঘন, তাই ভালো করে জল দিয়ে বাড়িয়ে সামান্য মেটানিল ইয়েলো দিলে দেখতে গরুর দুধের মত হয়।

দুধের রঙ কিভাবে ধরবেন?

মোষের দুধে যে মেটানিল ইয়োলো মেশানো হয়, তা রাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে ধরা যায়। শুধু দুধে নয়, দুগ্ধজাত দ্রব্যে অর্থাৎ রসগোল্লা, ছানা, সন্দেশ, বরফি বা খোয়াতে যদি মেটানিল ইয়েলো থাকে, তাহলে জল দিয়ে লঘু করা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিলে তার রঙ বদলে যায়। নাইট্রিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিডেও কাজ হয়। বিক্রিয়ায় রঙ হয় লালচে- বেগুনী। না হলে দুধের স্বাভাবিক রঙ বজায় থাকে।

ব্যবসার প্রয়োজনে মোষের দুধকে গরুর দুধের মতো দেখাতে চাইলে বিটা ক্যারোটিন যোগ করলেই চলে। অথবা গাজরের রসেও কাজ হবে। কারণ গাজরে ক্যারোটিন আছে। কৃত্রিম রঙ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সমীক্ষায় জানা যায় ২৫০টি দুগ্ধজাত নমুনার মধ্যে ২৫টিতে যে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে তা অনুমোদিত নয়। এরা হল কোলটার ডাই বা আলকাতরা উপজাত দ্রব্য। কেশরী রঙ, অরেঞ্জ টু, রোডামিন বি আর ওরামিন বেশী পরিমাণে পাওয়া গেছে। এগুলি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ভেজাল প্রযুক্তি ঃ কৃত্রিম দুধ

মোষের দুধে ও গরুর দুধে মিল্ক ফ্যাট ও সলিড নট ফ্যাট হওয়া উচিত যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৯ শতাংশ এবং ৩ শতাংশ ও ৮.৫ শতাংশ। এর কম হলে দুধ ভেজাল বলে গন্য হবে। কৃত্রিম দুধ প্রস্তুত করতে জলের সঙ্গে মেশানো হয় সাদা রঙের সস্তা ভোজ্য তেল, ইউরিয়া ও ডিটারজেন্ট পাউডার। আর এই সফেদ দুধই আনে শুভ্রতার ঝলক।

দুধের মধ্যে ল্যাকটোজ থাকে শর্করা হিসাবে। শরীরে ল্যাকটেজ এনজাইমের প্রভাবে ল্যাকটোজ গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজে পরিণত হয়। কৃত্রিম দুধে গ্যালাকটোজ পাওয়া সম্ভব নয়। ডিটারজেন্টের মধ্যে যে সোডা থাকে, তা থেকে 'লাইসিন' পাওয়া যায় না। দেহে পুষ্টির জন্য গ্যালাকটোজ ও লাইসিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড একান্ত প্রয়োজন। নিয়মিত খাদ্যের মাধ্যমে ইউরিয়া গ্রহণ করলে, রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কোমায় আক্রান্ত হতে পারে।

নকল মুসুর ডাল ও কালো জিরে

নকল মুসুর ডাল ও কালো জিরের রমরমা চলছে। মাটির সঙ্গে সিমেন্ট মিশিয়ে বড় বড় তালের আকার তৈরী করে রোদে শুকিয়ে পরে লোহার জালে ঘষা হয়। জালের ছিদ্র বিভিন্ন আকারের হয়। এর ফলেই তৈরী হয় নকল মুসুর ডাল বা কালোজিরে। সোনালী বা মেটানিল ইয়েলো রঙে ডুবিয়ে দিলেই হয়ে যাবে মুসুরি ডাল। পোড়া মোবিল মাখালে তৈরী হবে কালোজিরে। সস্তায় ঐ ডাল বা জিরে কিনে নিয়ে যায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। পরে তা চলে যায় কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে। ক্রেতারা এই ভেজাল খাদ্য কিনে খাচ্ছেন।

রাজ্যের বহু জেলায় এভাবেই ভেজাল চক্রের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন ঐ রঙ ও মোবিল খেলে পেটের অসুখ হবে। প্রশাসনিকস্তরে এই ভেজাল চক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে নামা দরকার। Prevention & Food Adulteration Act, 1956 আইন অনুযায়ী ভেজালদারদের কঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার।

ভেজাল প্রমাণে শাস্তির সুপারিশ

ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (FSSI) উপ অধিকর্তা জানিয়েছেন খাবারের মান নিয়ে সন্দেহ ও ভেজাল প্রমাণ হলে আর্থিক জরিমানা ও কারাদন্ড দুই-ই হতে পারে। (FSSI) এর মতে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় খাদ্য শিল্পের এক বিরাট বাজারের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয় খাবারের মান নিম্নমানের। ফলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সমস্যা বাড়ছে। ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন (FAO) এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (WHO)। খাদ্য সুরক্ষার বিষয়ে আন্তর্জাতিকমান নির্দিষ্ট করে। রাস্তার ধারে, হোটেল বা রেস্তোরায় যে খাবার বিক্রি হয় তা নজরদারি করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হেলথ্ ইনস্পেক্টর বা ফুড ইনস্পেক্টরদের খাদ্যের গুণমান পরীক্ষা করার কথা। বাস্তবে খাদ্যের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত কোন পরিকাঠামো নেই বললেই চলে। খোলা বাজারে যেভাবে মাংস বিক্রি হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন বৈধ ছাড়পত্র নেই (বিশেষ করে হেলথ্ ফিটনেস সার্টিফিকেট আদৌ থাকে না)।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গে পাখির খোঁজে - নতুন ভাবনার অন্বেষণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান সাপেক্ষে প্রাপ্ত পাখি প্রজাতির সংখ্যা ৮৫০ বা তার কিছু বেশি। এর মধ্যে স্থায়ী প্রজাতি ও পরিযায়ী প্রজাতি - দু'ধরণেরই পাখি আছে। এই রাজ্যের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে - বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে - রাঢ় (রুক্ষ) অঞ্চল; পূর্বে - বাংলাদেশ। বৃষ্টিপাত - উত্তরবঙ্গে গড়ে ৪০০০ মিমি প্রায়; দক্ষিণ বাংলায় - কম বেশি ১৫০০ মিনি প্রায় (শীতের পরিযায়ী পাখি, পার্বত্য অঞ্চলের পক্ষীকুল, বর্ষার প্রাকৃতিক পরিবেশ - নদী-খাল-বিল-বাঁওড়-পুকুর অধ্যুষিত জলাশয়ে নানা ধরণের জলচারী পাখির রয়েছে বিচিত্র সমাবেশ। এই রাজ্যের কৃষি বৈচিত্র্য ও বনাঞ্চল ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবনযাত্রায় নিরাপদ হিসাবেই বিবেচনাপ্রাপ্ত। অনেক সমস্যা আছে, সঙ্কট আছে; তবুও পাখিদের কলকাকলি আজও আমাদের মনকে রঙিন আনন্দে উদ্বেল করে।

পরিবেশ ভাবনা তথা জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা প্রয়াস আজ একটি প্রাসঙ্গিক কর্মভাবনা। ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণ আইন দেশে বলবৎ আছে। এর বাইরেও একাধিক আইনকানুন রয়েছে পাখি তথা জীবজন্তু - উদ্ভিদ সম্পদ সুরক্ষায় ও সংরক্ষণে। পশ্চিমবঙ্গে শখের পক্ষীপ্রেমীরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন বাড়িতে খাঁচায় পাখি পোষার নেশায় বিভোর অনেক পাখিবিলাসী মানুষজন। শখের পাখি দেখিয়েদের কাজ হলো বাইনোকুলার, ক্যামেরা (স্টিল ও মুভি) নিয়ে মাঠে ও জঙ্গলে, বন বাদাড়ে পাখির আস্তানায় গোপন চোখ রাখা। এদের খাদ্যাভাস, ডিম পাড়া, শাবক বড়ো করা এবং জীবনযাত্রার নানা খুঁটিনাটির বিস্তৃত তথ্য আহরণ। এসব নিয়ে লেখালিখি, কম্পিউটারের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, মেল ব্যবহার/অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান।

যাঁরা আগে পাখি পুষতেন খাঁচায় তাঁরা এখন নিদারুণ সঙ্কটে। ভারতীয় কোনও পাখিই প্রায় খাঁচায় রেখে পোষা যাবে না। এটা আইনত অপরাধ। এজন্য দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে তাঁরা খাঁচায় বিদেশি পাখি রাখছেন, যা এদেশে আইন সিদ্ধ। তাঁরা ডিম ফোটাচ্ছেন, বাচ্চা বড়ো করছেন— এসব হচ্ছে বিদেশি পাখি নিয়ে। দেশের পাখির গায়ে এঁরা হাত দিতে পারছেন না আইনে নিষেধাজ্ঞায়। শুনলাম এইসব বিদেশি পাখির আনাগোনা হয় সিঙ্গাপুর থেকে। এখানে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু রকম পাখি আসে; সেগুলিই নানা নিয়ম / বেনিয়ম পথ পেরিয়ে নানা দেশে প্রবেশ করে।

সারা পৃথিবী জুড়ে জীব বৈচিত্র সুরক্ষার অঙ্গ হিসাবে পাখি সংরক্ষণ ও এদের সংখ্যা বৃদ্ধি আজ একটি জরুরি ও প্রয়োজনীয় প্রয়াস হিসাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। শুধু গাছ লাগানো নয়; কৃষি কাজে - ফল চাষে বিপজ্জনক কীটনাশক ব্যবহারও নিষিদ্ধ হচ্ছে। পাখিদের সার্বিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষিত না হলে পাখিদের রক্ষা করা যাবে না - এ তথ্য সকলের জানা। পক্ষীপ্রেমী মানুষজনকে সংগঠিত করে সক্রিয় কর্মপ্রয়াস গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত পরিবেশ ভাবনাকে সামাজিক জাগরণের প্রেক্ষাপটে বিকশিত করায় আন্দোলনমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যে সব ভাবনা সংগঠিত প্রয়াসে গঠনমূলক দৃষ্টিতে এগিয়ে নেওয়া প্রয়োজনঃ—

১) পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা, যে সব প্রজাতির পাখি রয়েছে তাদের বাস্তুতন্ত্র, বাসা তৈরি, ডিমপাড়া, শাবক বড়ো ক রা,খাদ্যাভাস ইত্যাদির তথ্যপঞ্জি রচনা।

২) পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী পাখিদের সার্বিক তথ্যাদিও বাস্তুতন্ত্র সহতথ্যপঞ্জি সংকলন।

৩) কীটনাশক বিষ ও পরিবেশ উচ্ছেদ-বন ধ্বংস পাখিদের জীবনে কী কী সংকট ডেকে আনছে, তার নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ।

৪) মানুষের জন অরণ্যে (ভয়াবহ জনবিস্ফোরণ) পাখির জীবন সঙ্কট-এর উপর গবেষণা প্রয়াস শুরু করা।

৫) পশ্চিমবঙ্গের জলাভূমি কেমন আছে? এদের উপর নির্ভরশীল পাখিদের হাল হাকিকত সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করা।

৬) পাখি পোষা ও জীবিকার জন্য পাখির কেনাবেচা - পাখির সুরক্ষাকে নিশ্চিত করা - এনিয়ে ভারত সরকারের বন্যপ্রাণী আইন পুনর্বিবেচনার দাবি করা। খাঁচায় বা আবদ্ধ স্থানে পাখির প্রজনন একটি উত্তেজক সৃষ্টিশীল কর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে স্থান পেতে পারে।

৭) নানা অসাধু-বেআইনী কার্যকলার বন্ধে সরকারি সুরক্ষা প্রয়াস জোরদার করায় সচেতন গণ আন্দোলনকে কেন্দ্রীভূত করা।

৮) পাখি নিয়ে প্রচলিত লোকজ্ঞানকে সংগ্রহ করে পক্ষীচর্চার প্রয়াসকে সমৃদ্ধ করা।

— লেখক : দীপক কুমার দাঁ

পরিচালক : গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ. ফোন - ৯৪৭৪১৯২৭৯৯

জলের প্রতিবাদ

আমরা জল,
তোমরা আমাদের ছাড়া বাঁচতে পারো না।
একবার তাকাও মরুভূমির দিকে, দেখ,
আমরা ছাড়া তাদের জীবন কত কষ্টকর।
আমাদের অপচয় কোরো না,
আমাদেরও শক্তি আছে পৃথিবী ধ্বংস করার,
আমরাও পৃথিবীকে বদলে দিতে পারি,
হয় সমুদ্র, নয়তো করতে পারি
মরুভূমি।

—ঝর্ণোৎস দাশগুপ্ত
ছাত্র, কান্তি চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, শ্যামনগর

ব্রহ্মাণ্ডের বয়স

বহুল প্রচলিত তত্ত্ব অনুসারে 'বিগ ব্যাং' এর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে ব্রহ্মান্ড। এ তত্ত্ব সর্বজন স্বীকৃত হলেও কিন্তু কত দিন পূর্বে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছে সন্দেহ ও বিতর্ক। এ বিতর্ক বা সন্দেহ যাই বলা যাক না কেন, নূতন নয়। ৮০-৮৩ বছরের পুরনো। বস্তুত মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে ছায়াপথগুলি একে অপরের থেকে সমানুপাতিক বেগে দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে তত্ত্ব প্রকাশ ও প্রমাণ সাপেক্ষে দেখালে (১৯২৯ সালে) ওই সন্দেহ আরও দানা বাঁধে।

৩ পদ্ধতির সাহায্যে সচারাচর ব্রহ্মান্ডের বয়স জানা যায়।

১ম পদ্ধতি ঃ নক্ষত্রের আলোর বর্ণালী অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে তাতে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর অনুপাত থেকে নক্ষত্রের বয়স নিরিখে ব্রহ্মান্ডের বয়স জানা যায়।

২য় পদ্ধতি ঃ প্রাচীনতম ছায়াপথে উপস্থিত প্রাচীতম নক্ষত্রের ভর ও ঔজ্জ্বল্যের ভিত্তিতে তার বয়স নির্ণয় করা যায়। এ পদ্ধতিতে ওই নক্ষত্রের বয়স প্রায় ১০২০-১২৮০ কোটি বছর। এই হিসাবে ব্রহ্মান্ডের বয়স আরও বেশি। প্রায় ১৩৭০ কোটি বছর।

৩য় পদ্ধতি ঃ ছায়াপথে সবচেয়ে ম্লান শ্বেত বামন নক্ষত্রের আলোক বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করে তার বয়স নির্ণয় করা যায়। এ পদ্ধতিতে একাই শ্বেত বামনের বয়স প্রায় ১০০০ কোটি বছর নির্ণয় করা হয়েছে। নক্ষত্র থেকে শ্বেত বামন হতে ১৩৭০-১০০০=৩৭০ কোটি বছর নেওয়া স্বাভাবিক। এ হিসাবেও ব্রহ্মান্ডের বয়স ১০০০+৩৭০=১৩৭০ কোটি বছর হওয়া স্বাভাবিক।

ছায়া পথগুলির পারস্পরিক সম্প্রসারণ বেগ কমিয়ে সবগুলিই একটি বিন্দুতে অবস্থান করছে এমন কল্পনা করে এবং আরও আরও পিছিয়ে গিয়ে হিসেব করে দেখা গিয়েছে ব্রহ্মান্ডের বয়স ১৩৭০ কোটি বছর নয়। আরও ১৭০ কোটি বছর কম।

পৃথিবী থেকে প্রায় ৯০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে আবিষ্কার হয়েছে একটি গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ। এখানে অবস্থান করছে প্রায় হাজারখানেক নক্ষত্র। নাসা ও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির তথ্যানুসারে এটির অবস্থান ব্রহ্মান্ডের সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে। মীন রাশির যে ছায়াপথে এটির অবস্থান তা ব্রহ্মান্ডের ৫০০ কোটি বছর বয়সে সৃষ্ট। এর মহাজাগতিক হিসাব নিকাশ অনুসারে ব্রহ্মান্ডের বয়স তত্ত্বানুসারে যা ধরা হয় তার থেকে বহু কম।

১ম তারকার জন্ম কতদিন পূর্বে এ তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, ব্রিটেন ও আমেরিকার জ্যোতির্বিদরা যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন তা থেকে মহাবিশ্বের বয়স ১৩৭০ কোটি বছর নির্ণিত হয়েছে। একইভাবে একই বিষয়ের উপর গবেষণা চালাতে গিয়ে Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics, Britains Cambridge Institute of Astronomy, University of California, Masachusetts Institute of Techanalogy-র যৌথ গবেষণায় ওই একই বয়স ধরা পড়েছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের জন্ম যে ১৩৭০ কোটি বছরের কম নয়, তা প্রমাণিত হয়েছে।

হাবল্ স্পেস টেলিস্কোপে ব্রহ্মান্ডের ৭০ কোটি বয়সের ছায়াপথের চিত্র ধরা পড়েছে। বহুদূরে অবস্থান করছে এমন সব ছায়াপথের মধ্যে এটিই বয়স সবচেয়ে নবীন। এরই নিরিখে বলা যায় প্রাচীন ছায়াপথগুলির বয়স আরও বেশি। কাজেই ব্রহ্মান্ডের বয়স ১৩৭০ কোটি বছর হলেও হতে পারে। বস্তুত এ সম্পর্কে সন্দেহ-এর অবকাশ না রাখাই ভালো।

তথ্য সূত্র ঃ ১) মহাবিশ্বের ১ম আলো-বিমান নাথ, পৃষ্ঠা ৬১

২) আনন্দমেলা ১৬-০২-২০০০, ৩) ব্রহ্মান্ডের বয়স নিয়ে সংশ্রয়, বর্তমান ০৪-০৪-০৫, ৪) Universes first star–The Statesman SCI-Tech *লেখক : সোমা সেনাপতি-৯২৩১৩৫১৭৯০*

বিজ্ঞান সম্মেলন

৭ই এপ্রিল ২০১৩ চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ও কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার একটি বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করেছিল চাকদহ গৌড়নগর ঘাটে। আগত অতিথিদের আপ্যায়ণের যানবাহন খুঁজে দেওয়ার জন্য আমরা চাকদহ স্টেশনে উপস্থিত ছিলাম (অর্থাৎ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যরা)। অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১১টায় প্রকৃতির কোলে গঙ্গার ধারের ধুলোর হাওয়া টিফিন খেতে খেতে এবং পরিচয় পর্ব দিয়ে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল বিজ্ঞান ভিত্তিক পেপার বিষয়ক আলোচনা, যেটা জমে ওঠে শুরুতে আমাদের গানে এবং বড়োদের বক্তৃতায়। একজন বললে অন্যরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে। এইভাবে প্রায় ১০০ লোককে নিয়ে চলতে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মধ্যেই চলতে থাকে বই বিক্রি ও পরবর্তী বিজ্ঞান সম্মেলনের প্রচার। সম্মেলনে আগামী দিনে যৌথ ভাবে কর্মসূচী নেওয়ার জন্য একটি সম্বনয়কারী দল তৈরী হয়। — *সঞ্জু বিশ্বাস, চাকদহ*

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২

সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) **E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in**